প্রথম আলো

কলাম

বিশ্লেষণ

বিদেশে দক্ষ নার্স পাঠাতে বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে পড়ছে

লেখা: মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, সেলিম রেজা ও কে এম নূর-ই-জান্নাত নদী

প্রকাশ: ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ১৭: ৫৩

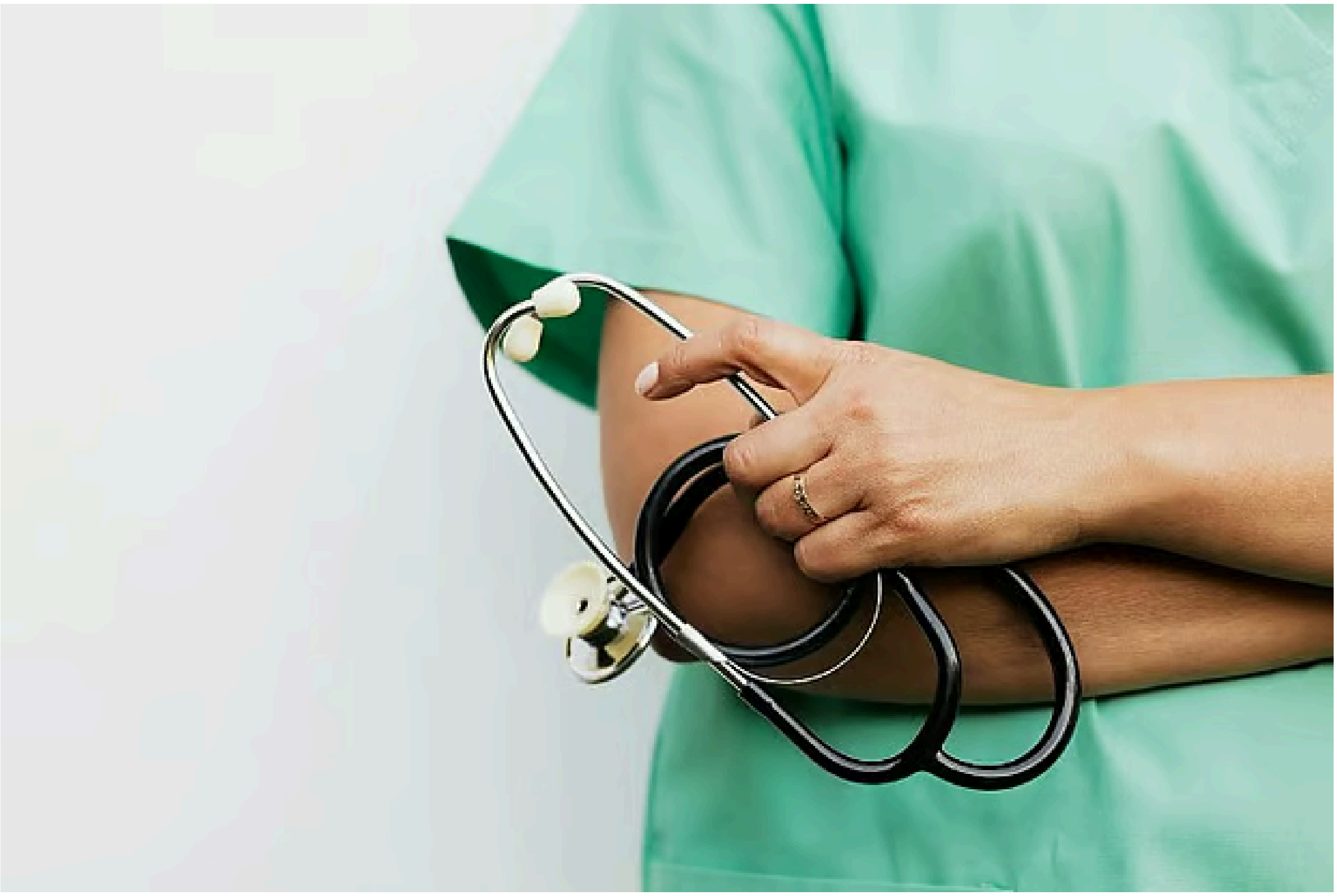

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমাদের দেশের উন্নয়নের পথে দুটি বড় সমস্যা রয়েছে, যেগুলোর দিকে আমরা ঠিকমতো নজর দিচ্ছি না। প্রথম সমস্যা হলো, বিদেশে অনেক নার্সের চাহিদা রয়েছে, কিন্তু আমরা দক্ষ নার্স তৈরি করতে পারছি না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক বিদেশে ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, এ দুটি সমস্যার

পেছনে আছে আমাদের ব্যবস্থার দুর্বলতা, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের প্রতি অনীহা। মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য আমাদের সবাইকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, কীভাবে আমরা এ সমস্যা দূর করতে পারি?

বিশ্ববাজারে নার্স ও মিডওয়াইফের বিপুল চাহিদা

বাংলাদেশের নার্সিং খাত নিয়ে আমাদের যেকোনো পর্যবেক্ষণ বা নীতি পর্যালোচনা করার আগে বিশ্বে নার্স ও মিডওয়াইফের প্রকৃত চাহিদা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ২৯ কোটি নার্স এবং ২ দশমিক ২ কোটি মিডওয়াইফ সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা বাড়ার কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪ দশমিক ৫ কোটি নার্স ও ৩১ লাখ মিডওয়াইফের ঘাটতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আরও একটি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই ঘাটতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে নিম্ন ও নিম্নমধ্য আয়ের দেশগুলোর ওপর।

এ চাহিদা পূরণের জন্য অনেক দেশ ইতিমধ্যেই বিদেশি নার্স নিয়োগের দিকে ঝুঁকছে। যেমন ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত নার্সের সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৭৫ হাজার ৩9০। ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে ৭ লাখ ৪৮ হাজার, জার্মানিতে ১০ লাখ ৪ হাজার, জাপানে ১৭ লাখ ৩৪ হাজার এবং ২০২৩ সালে সৌদি আরবে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬১ জন নিবন্ধিত নার্স কাজ করেছেন (সূত্র: সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো)। এই উপাত্তগুলো প্রমাণ করে, বৈশ্বিক বাজারে নার্সিং পেশার বিশাল চাহিদা রয়েছে।

এ চাহিদাকে মাথায় রেখে কিছু দেশ অনেক আগেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নার্স রপ্তানি করে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি দেশ হলো ভারত ও ফিলিপাইন। ভারত থেকে প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার নার্স বর্তমানে বিদেশে কাজ করছেন, যাঁদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত। অনুমান করা হচ্ছে, আগামী ছয় থেকে সাত বছরে এই চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। ফিলিপাইন নার্স রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশ। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার ফিলিপিনো নার্স বিদেশে কাজ করছিলেন। শুধু ২০২৩ সালেই আন্তর্জাতিক বাজারে নতুনভাবে নিযুক্ত হন ১৩ হাজার ২২৩ জন ফিলিপিনো নার্সিং পেশাজীবী। এই নার্সদের প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) তাঁদের দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে নার্সদের পাঠানো রেমিট্যান্স বছরে প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা সে দেশের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং জিডিপির প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ (সূত্র: রয়টার্স ও ইকোনমিক টাইমস)।

এই বৈশ্বিক চাহিদা ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বাংলাদেশের নার্সিং খাত নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক মানের নার্স তৈরি করা সম্ভব, যার উদাহরণ গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান নার্সিং কলেজ। এই কলেজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন,

যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন উন্নত দেশ বাংলাদেশ থেকে নার্স নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে নানামুখী চ্যালেঞ্জের কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এই বিপুল চাহিদার সুযোগ নিতে পারছি না। এর প্রধান কারণ হলো নার্সিং শিক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান নীতিগত ও কাঠামোগত বাধা।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়

বাংলাদেশের নার্সিং খাতে বড় কাঠামোগত সমস্যাগুলোর একটি হলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রামের অভাব। অনেক বাংলাদেশি নার্সের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকলেও স্বীকৃত বিএসসি বা এমএসসি ডিগ্রি না থাকার কারণে তাঁরা বিদেশে চাকরি পাওয়ার সুযোগ পান না। আবার যেখানে এই ডিগ্রি পাওয়া যায়, সেখানকার পাঠ্যক্রম অনেক সময় দুর্বল বা পুরোনো ধাঁচের, যেটা আন্তর্জাতিক গাইডলাইন বা দক্ষতার মানদণ্ডের সঙ্গে মেলে না।

বাংলাদেশে নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা এখনো সীমাবদ্ধ কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে বিএসসি ও এমএসসি ইন নার্সিং প্রোগ্রাম চালু আছে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি হাসপাতালখ্যাত সাবেক বিএসএমএমইউ), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট এম এ গফুর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী নার্সিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

এই সংকট কেবল আসনের সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, এর পেছনে রয়েছে গভীর পেশাগত স্বার্থ, ক্ষমতা রক্ষার মানসিকতা এবং নীতিনির্ধারকদের 'গেটকিপিং' প্রবণতা। নার্সিং শিক্ষায় সবচেয়ে বড় বাধা এসেছে চিকিৎসক সমাজ ও মেডিকেল প্রশাসনের ভেতর থেকে। ঐতিহাসিকভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণ করে আসা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর আশঙ্কা হলো, যদি নার্সরা এমএসসি বা পিএইচডি ডিগ্রির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন, তবে তাঁরা রোগী ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও হাসপাতালের নেতৃত্বে অংশ নিতে শুরু করবেন। এতে হাসপাতালের প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামো ভেঙে পড়বে বলে অনেক চিকিৎসক মনে করেন।

এ ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলো নার্সিং শিক্ষার একচেটিয়া দখল ধরে রাখতে চায়। তাদের আশঙ্কা, যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই খাতে প্রবেশ করে, তবে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, শিক্ষার্থীরা বিকল্প পাবেন এবং সরকারি ধাঁচের নিজস্ব কাঠামোকে সংস্কার করার প্রয়োজন দেখা দেবে। ফলে তারা বেসরকারি অংশগ্রহণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকে। নার্সিং শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিপক্ষে তাদের কঠোর ও পক্ষপাতদুষ্ট এই মনোভাব দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে আরও কুৎসিত রূপ নিয়েছে।

এই কাঠামোগত সংকটকে আরও জোরালো করেছে বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি)। সংস্থাটির কাজ হওয়া উচিত মাননির্ভর শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার পরিধি প্রসারিত করা। কিন্তু বাস্তবে বিএনএমসি প্রায়ই গেটকিপারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সংস্থাটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নার্সিং

প্রোগ্রামের অনুমতি না দিয়ে গোটা সেক্টর কার্যত সরকারি নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। অথচ বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এমবিবিএস প্রোগ্রাম চালিয়ে আসছে। নার্সিং শিক্ষার ক্ষেত্রেও এমবিবিএসের অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল।

এই দ্বৈত নীতির ফলে শুধু কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে, আর হাজারো যোগ্য শিক্ষার্থী ভর্তি হতে না পেরে পিছিয়ে পড়েন। এটিকে কেবল মান নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি আসলে ক্ষমতা রক্ষা ও প্রতিযোগিতা ঠেকানোর একটি সুপরিকল্পিত কূটকৌশল।

তবে গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান নার্সিং কলেজ এ পরিস্থিতিতে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে পরিচালিত এই কলেজ আন্তর্জাতিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে মানসম্মত নার্সিং শিক্ষা প্রদান করে আসছে। তবে এখানকার শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পেতে হয়, যাতে সেই সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য হয়। এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও মানসম্পন্ন নার্স তৈরি করা সম্ভব, যদি নিয়ন্ত্রক কাঠামো সহায়ক হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু নিজেদের অবকাঠামো ও শিক্ষকের মানেই নয়, তারা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তুলতেও সক্ষম। ইতিমধ্যে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে একাডেমিক চুক্তি রয়েছে, যা তাদের আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম চালু, যৌথ ডিগ্রি প্রদান এবং তাদের শিক্ষার্থীদের বিদেশে চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার সক্ষমতা দেয়। সঠিক তদারকি ও অনুমোদনের মাধ্যমে তারা বিদেশে নার্স রপ্তানির সুযোগ কাজে লাগাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

সব মিলিয়ে এ সংকট শুধুই সক্ষমতার অভাব নয়; এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাঠামোগত বাধা, যা রাজনৈতিক দ্বিধা, পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও আমলাতান্ত্রিক অদূরদর্শিতায় তৈরি হয়েছে। এসব বাধা না ভাঙলে আমরা একদিকে যেমন নিজ দেশে নার্সদের ভবিষ্যৎ আটকে রাখব, তেমনি বৈশ্বিক নার্স চাহিদার বাজারেও বাংলাদেশ নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে।

ভুয়া সার্টিফিকেট ও দক্ষতার স্বীকৃতির অভাব

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের আরেকটি গভীর সংকটের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হলো ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে বিদেশে কাজের সুযোগ নেওয়া। হ্যাঁ, আমাদের দেশে ভুয়া সার্টিফিকেট বানানো এবং তা ব্যবহার করে বিদেশে কাজ নেওয়ার মতো দুর্নীতি বন্ধ করা জরুরি। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের আরও কিছু গভীর কাঠামোগত বিষয় চিন্তা করতে হবে, যা কিনা এসব ভুয়া সার্টিফিকেট তৈরি ও ব্যবহারের জন্য শ্রমিকদের নানাভাবে উৎসাহ দেয় এবং অন্য কোনো বিকল্প না পেয়ে এ ধরনের অনিয়মের জালে ঢুকতে শ্রমিকদের বাধ্য করে।

এ সমস্যাকে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা হিসেবে দেখা সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও কাঠামোগত বৈষম্য, নিয়োগকারী দেশের দায়িত্বহীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। আমরা যখন বিদেশে শ্রমিক পাঠাই, তখন সেই দেশগুলোর সঙ্গে করা চুক্তিগুলোয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না; বিশেষ করে কাজের স্বীকৃতি ও দক্ষতার সার্টিফিকেশন-সংক্রান্ত স্পষ্ট শর্তাবলি। ফলে সুযোগসন্ধানীরা নানা অজুহাতে আমাদের শ্রমিকদের হয়রানি করে।

উন্নত দেশগুলোয় 'অ্যাপ্রেনটিসশিপ' বা 'অন দ্য জব ট্রেইনিং' নামে একটি স্বীকৃত ব্যবস্থা আছে, যেখানে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের একটি আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে চাকরির আবেদন বা ভিন্ন খাতে পেশা বদলের ক্ষেত্রে কাজে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য এই সুবিধা প্রায় অনুপস্থিত। আমরা নিয়োগের আগেই অভিজ্ঞতা খুঁজি, নিয়োগ দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করি না। ফলে অল্প কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন শ্রমিক যখন নতুন করে অন্য কোনো কাজে আবেদন করেন, তখন তাঁকে 'অদক্ষ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অস্বীকৃতি তাঁদের এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়, যেখানে ভুয়া সার্টিফিকেট তৈরি করে উপস্থাপন করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। অর্থাৎ, দুর্নীতি শুধু অভ্যন্তরীণ দিক থেকেই নয়, আন্তর্জাতিক কাঠামোর দায়হীনতাও এর একটি বড় কারণ। এখানে প্রশ্ন আসে, বিদেশে শ্রমিক পাঠানো চুক্তির সময়ই আমরা কেন এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি না?

সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের পথ কেবল ভুয়া সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে আইন করা বা শাস্তি দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সরকারের উচিত আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি স্কিল সার্টিফিকেশন ও অ্যাপ্রেনটিসশিপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেই তা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। এ ধরনের সার্টিফিকেট ডিজিটালভাবে যাচাইযোগ্য হলে জালিয়াতির আশঙ্কাও কমে যাবে।

পরিশেষে অধ্যাপক ইউনূস যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেছেন—নার্সিং শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও ভুয়া সার্টিফিকেটের প্রসঙ্গ—সেগুলো দূর করতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। নার্সিং শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও কাজের দক্ষতার পর্যাপ্ত স্বীকৃতিসহ অন্যান্য কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ববাজার উপযোগী দক্ষ নার্স তৈরি করতে পারলে বিদেশের শ্রমবাজারে আমাদের জন্য রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

- **ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার ও ড. সেলিম রেজা;** শিক্ষক ও গবেষক, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ (সিএমএস), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

- **কে এম নূর-ই-জান্নাত নদী;** গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ (সিএমএস), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো